ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 827-842
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.074

সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথায় কলুটোলা-সেনবাড়ির অন্তঃপুরচিত্র

সৌমী বসু, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In this present article, we are attempting to understand the inner quarters of the Sen family of Kolutola, Kolkata (former Calcutta) within the backdrop of 19th Century Bengal, through the autobiographical narrative of Saradasundari Devi (1819-1907). Saradasundari Devi was the wife of Pyarimohan, the second son of renowned wealthy Dewan Ramkamal Sen of colonial bengal's newly emerging city Calcutta, and the mother of Brahmananda Keshab Chandra Sen. Through the life story of Saradasundari Devi, we will explore the inner world of the Sen household and the lives of its women, as well as the family ethos of the household and the cohabitation of people with faith in both Hinduism and Brahmoism. We will read her autobiographical narrative in conjunction with social history and analyse why this memoir of a women from inner quarters of the Sen household has become an essential document for understanding the family and social history of 19th century Bengal.

Keywords: Nineteenth Century, Colonial Bengal, Kolutala Sen household, Inner world of Family, Memoir of Women, Hinduism & Brahmoism, Family & Social History.

অগ্রহায়ন ১৩১৪-র 'মহিলা' পত্রিকা থেকে জানা যায় 'গত ২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৭টার সময় পরম ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশব সেন মহাশয়ের বন্দনীয়া মাতৃদেবী ন্যূনাধিক ৯০ বৎসর বয়সে' স্বর্গগত হয়েছেন এবং 'অতিশয় সেবাপরায়ণা মধুরপ্রকৃতি ধর্ম্মানুরাগিণী ভক্তিমতী পরম দয়াময়ী' মাতার 'পবিত্র জীবন কাহিনী' আগামীতে প্রকাশের জন্য পত্রিকাটি যত্নবান হবে। এই প্রতিশ্রুতি মতই উক্ত পত্রিকাটির ১৩১৪ বঙ্গাব্দের পৌষ, মাঘ, চৈত্র সংখ্যায় ও ১৩১৫-র বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ সংখ্যায় এবং ১৩১৬-র ভাদ্র, আশ্বিন সংখ্যায়; সর্বমোট বারোটি কিস্তিতে 'কেশবজননী সাধ্বী সারদাদেবী' প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে তা ঢাকার ভারত মহিলা প্রেস থেকে ১৯১৩-র ৩১ ডিসেম্বর 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বইটির সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর; যিনি পারিবারিক সম্পর্কে ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবীর নাতজামাই (সারদাসুন্দরী এবং প্যারীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণবিহারীর জ্যেষ্ঠ কন্যা

সরলাসুন্দরীর স্বামী)। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের 'নববিধান' প্রচারক প্রিয়নাথ মল্লিক তথা সেবক শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সারদাসুন্দরীর মুখে বলে যাওয়া জীবনকথাকে তাঁর সামনেই অনুলিখন করতেন যোগেন্দ্রলাল এবং সেই লেখাকে সারদাসুন্দরীর নাতনী তথা যোগেন্দ্রপত্নী সরলাসুন্দরী পরিশ্রম সহকারে প্রতিলিখন করে 'মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৩৯০ বঙ্গাব্দের 'এক্ষণ' শারদীয় সংখ্যায় উক্ত আত্মকথাটি 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা' শীর্ষকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

আত্মকথার প্রথম বাক্যটি জানান দেয় যোগেন্দ্রলালকে সারদাসুন্দরী যখন তাঁর জীবনকথা বলতে শুরু করছেন, তখন সময় ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ। ১৮১৯-এ জন্মগ্রহণ করা সারদা দেবীর বয়স তখন ৭৩ বছর। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে কেন সত্তরোর্ধ সারদাসুন্দরী উত্তরপ্রজন্মকে নিজের কথা শোনাতে, জানাতে আগ্রহী হলেন? উত্তর মেলে গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে যেখানে যোগেন্দ্রলাল জানান 'ভক্তিভাজন পরম ভক্ত কোনও প্রচারকের বিশেষ অনুরোধে' তিনি এই জীবনী লিখতে প্রবৃত্ত হন এবং সেই প্রচারক তাঁকে আচার্য্যমাতার জীবনী লিখে নিজে ধন্য হতে এবং জগতের উপকার করতে উপদেশ দেন। এই উপদেশ তাঁর মনঃপুত হলে তিনি সারদাসুন্দরীকে তাঁর জীবনী বলার জন্য অনুরোধ করেন। নাতজামাইয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ সারদাসুন্দরী 'আমার আবার জীবন-চরিত কি' বলে সেই অনুরোধ 'উড়াইয়া দিতে চেষ্টা' করলে যোগেন্দ্রলাল এবং অন্যান্য আরও অনেকে কেশবমাতাকে বুঝিয়ে সম্মত করেন এই বলে- '...আপনার জীবনী আপনার সম্পত্তি নয়, সহস্র বৎসর পরে জগতের লোক যখন আপনাকে খুঁজিবে, এবং আপনার সম্বন্ধে নানারূপ সত্য মিথ্যা কল্পনা করিবে, তখন আপনি এই জন্য ভগবানের নিকট এবং জগতের লোকের নিকট দায়ী হইবেন।'[১] প্রশ্ন জাগতে পারে কেন সারদা দেবীর নিজের জীবনী তাঁর নিজের নয় এবং সহস্র বৎসর পরে জগতের লোক কেনইবা তাঁকে খুঁজবে? এই দুই প্রশ্নের উত্তর আমরা এই নিবন্ধের অন্তিমে বোঝার চেষ্টা করবো, কিন্তু তার আগে প্রাথমিকভাবে আমরা আত্মকথাটির মধ্যে প্রবেশ করবো।

সুদক্ষিণা ঘোষ লিখছেন, 'অল্প কিছুদিন হল আমরা মাতা-মাতামহী-পিতামহীদের সলজ্জ সঞ্চয়ের বৈভব উদ্ধারে মনোযোগী হয়েছি- খুঁজতে শুরু করেছি তাঁদের কলমের এলোমেলো আঁচড়, ঘোমটার আড়ালে আবছা মুখের ছবি।'[২] এমনই এক আবছা মুখের ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সারদাসুন্দরীর আত্মকথা পড়তে পড়তে। অন্তঃপুরিকার লেখায় ধরা দেয় সমকাল, প্রসিদ্ধ সেনবাড়ির অন্তঃপুর, সাদায়-কালোয় পারিবারিক ছবি, আচার-অনুষ্ঠান, পারিবারিক সম্পর্কের ঘূর্ণাবর্ত আর সর্বোপরি অন্তরালবর্তিনী নারীর গণ্ডি-বন্ধনে আবদ্ধ চড়াই-উৎরাইভরা জীবন; যেখানে এসে ধাক্কা দিয়েছে চলমান সময়স্রোত। কে ছিলেন সারদাসুন্দরী? সামাজিক পরিচয় সূত্রে বলা যায়, ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে গড়ে ওঠা নতুন শহর-কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনী দেওয়ান রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের পত্নী ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মাতা ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী।

সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথার মধ্য দিয়ে কলুটোলার সেনবাড়ির অন্তঃপুরকে বোঝার জন্য আমাদের সংক্ষিপ্তভাবে বুঝে নিতে হবে তাঁর শ্বশুরমশাই বিখ্যাত ধনী দেওয়ান রামকমল সেনকে কেননা তাঁর মাধ্যমেই কলুটোলার সেনবাড়ির গরিমার সূচনা। ভাগীরথী-তীরবর্তী গরিফা গ্রামে ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করা রামকমল গ্রামে থাকতে সংস্কৃতও শিখলেও পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতে ইংরেজি ভাষাই যে তাঁর উচ্চাশা পূরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে তা বুঝে নিয়েছিলেন সহজেই। তাই তিনি গ্রামে পাদ্রীর স্কুলে এবং

পরে কলকাতায় এসে ইংরেজী শিখেছিলেন রামজয় দত্তর স্কুলে। সতের বছর বয়স (সাল ১৮০০) থেকে কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত রামকমলের কাজের জীবন শুরু হয়েছিল কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার নেমীর অধীনে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী রামকমল নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার গুণে ১৮৩২ সালে অর্জন করেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানীর পদ এবং আমৃত্যু তিনি ছিলেন এই পদে অধিষ্ঠিত। শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয়, রামকমলের আজীবন যুক্ত ছিলেন উনিশ শতকের প্রথম পাদে গড়ে ওঠা প্রায় সবরকমের স্বদেশীয় উন্নতিকল্পে। হিন্দু কলেজ, স্কুল-বুক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, গৌড়ীয় সমাজ, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছিলেন ওতোপ্রতো ভাবে যুক্ত।[৩] আট টাকা মাসিক বেতনে হিন্দুস্থানী প্রেসে কর্মে নিযুক্ত রামকলম তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধিমত্তা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতার বলে নিজের অবস্থাকে সেই জায়গায় নিয়ে যান যেখানে তিনি তাঁর অবর্তমানে নিজের উত্তরাধিকারীদের জন্য ৮/১০ লক্ষ টাকার বিষয় রেখে গেছিলেন। চার ছেলের প্রত্যেককে দিয়েছিলেন ৮০,০০০ টাকা নগদ, অজস্র সোনা-রূপার বাসন, সোনা-মুক্তা-জড়োয়ার আনুমানিক ৫০,০০০ টাকার গহনা এবং কলকাতার উপর প্রায় সতের খানা বাড়ি।[৪] বিদেশী শাসকের অধীনে কর্মজীবন ব্যতীত করা এবং তাঁদের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্কের পরিনতিতেই যে রামকমলের এরূপ সুবিপুল আর্থিক সমৃদ্ধি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের আলোচনায় রামকমল সম্পর্কে এইগুলি তথ্য পেশের কারণ হল, আমরা দেখে নিতে চাইবো এ-হেন রামকমল; কলুটোলার সেনবাড়ির নীতি-নির্ধারক, নিজের পরিবারের ক্ষেত্রে, অন্তঃপুরের ক্ষেত্রে কী ধরণের ভাবনাচিন্তা করেছিলেন?

রামকমল সেন বিবাহ করেছিলেন ১৮০৩-এ অর্থাৎ কুড়ি বছর বয়সে। পাত্রীর বয়স সম্পর্কে বিশদ জানা না গেলেও এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না পাত্রী নিতান্ত বালিকাই ছিলেন। কেননা ১৮২৮-এ যখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহনের বিবাহের বন্দোবস্ত করছেন তখন পাত্রী সারদাসুন্দরী নয় বছরের বালিকা। সুতরাং সেন পরিবারের প্রধান যে হিন্দুধর্মের শাস্ত্র-নির্দেশিত বাল্যবিবাহের সপক্ষেই ছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'হিন্দুর নিয়মমত এক বৎসর বাপের বাড়ী' থাকার পর শাক্ত পরিবারের কন্যা সারদা দশ বছর বয়সে চলে আসেন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী শ্বশুরবাড়িতে। নিজের ঘর-পরিবার-স্বজন ছেড়ে চিরতরে স্বামীগৃহে চলে আসার সময়টা বড় সহজ ছিল না ছোট সারদার জন্য। তাঁকে বলতে শুনি- 'শ্বশুরবাড়ী আসিবার পূর্ব্বে আমার বড় ভয় হইত, মনে হইত, কোথায় যাইব। ভাবিতাম যেন আমায় কয়েদ করিবে, কিম্বা ফাঁসি দিবে। এই ভাবিয়া একমাস পর্য্যন্ত কাঁদিয়াছিলাম। শেষে আমার বাবা জোর করিয়া যখন শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া গেলেন তখন মনে হইল যেন আমায় জলে ফেলিয়া দিলেন।'[৫] সারদাসুন্দরীর এই আতঙ্কিত স্বর মনে পড়ায় অপর একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে; তিনি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী। ১৮৭৬ সালে প্রকাশ পাওয়া 'আমার জীবন'-এ তিনি লিখেছেন কী ভাবে আকুল কান্নায় তাঁর 'গলা শুকিয়ে গেল এবং ক্রন্দন-শক্তিও রহিত হইয়া গেল।' ভীতি, আশঙ্কায় একাকার রাসসুন্দরী সেসময়ে নিজের মনের অবস্থাকে পূজায় বলিপ্রদত্ত পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৬] বিবাহ বিষয়ে প্রাথমিক অনুভবে দুই কন্যারই মানসিক সাদৃশ্য আমাদের ভাবায়, আমাদের বোঝায় ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শে আদর্শায়িত ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ'-এ বাল্যবিবাহকে যতই 'গুণ'যুক্ত তকমা দিন না কেন[৭] বাস্তব অবস্থাটা ঠিক তা ছিল না বরং বাল্যবিবাহের বিষময় ফলাফল ঠিক কীরূপ ছিল তার ভূরিভূরি নিদর্শন তৎকালীন সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা জুড়ে পাওয়া যায়। বিবাহ বোঝার আগেই বিবাহসম্পন্ন হয়ে যাওয়া ও চিরকালের নিজের ঘরদোর ছেড়ে নতুন গৃহ-পরিবারে এসে পড়া; এ যেন 'কোন গাছের বাকল কোন্ গাছে' লাগা!

বোঝা যায় সেকারণেই সারদা বলেন- 'যদিও বহুদিন হইতে মনে করিতাম, আমাদের এই সব হিন্দু নিয়ম খুব ভাল, কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বেশ বড় হইয়া বিবাহ হইলেই ভাল; কেন-না তাহা হইলে আর এই সব কষ্ট সহ্য করিতে হয় না।'[৮]

দশ বছরের সারদার স্বামী-ঘর করতে আসার দিনগুলো তাঁর জন্য বড় সহজ ছিল না। একজন বালিকার যে স্নেহ-যত্ন-উষ্ণতার প্রয়োজন শ্বশুরবাড়ি তা দিতে খুব সমর্থ হয়েছিল বলে বোধ হয় না। বালিকাবধূর সঙ্গে বালিকাসুলভ আচরণের প্রমাণ বিশেষ মেলে না সারদাসুন্দরীর আত্মকথায়। শ্বশুর রামকমল সেন সারদাকে স্নেহ করলেও গৃহকর্ত্রী শ্বশ্রূমাতার খুব স্নেহভাজন তিনি হয়েছিলেন এমন তথ্য আত্মকথা মেলে না। বরং বালিকাবধূর 'একটু দোষ দেখিলেই' শ্বশুরকে বলে বকুনি খাওয়ানোর ছবিই সামনে আসে। ঘর-গেরস্থালির মধ্যের দমবন্ধ অবস্থা, ভয়ের অনুভব আসলে সমকালের প্রায় কমবেশি প্রতি ঘরের কাহিনী। তাঁর নিজের কথায়- 'প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসিয়া যখন এক একজনের মুখপানে চাইতাম আমার এক এক পোয়া করিয়া রক্ত শুকাইয়া যাইত। ভয় হইত, কে কি বলিবেন। আমি তিন সন্তানের মা হইলাম, তখন পর্য্যন্ত আমার ভয় ছিল।'[৯] আমরা যদি একটু তলিয়ে ভাবার চেষ্টা করি কী কারণে এমন 'রক্ত শুকাইয়া' যাওয়ার মতো ভয় তাঁকে গ্রাস করেছিল? সরাসরি কোন ঘটনাবলীর উল্লেখ তো মেলে না কিন্তু কয়েকটি বিষয় আমাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে, ভাবায়। রীতিমতো সম্পন্ন পরিবারের বধূ হওয়ার পরেও শ্বশুরবাড়ির জীবন যে অক্লান্ত পরিশ্রমেরই ছিল তা রাসসুন্দরী, সারদাসুন্দরী উভয়ের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। বাড়িতে 'অনেক দাসদাসী' থাকলেও সারদার শাশুড়ি 'দাসীকে ঘরে আসতে দিতেন না' এবং বড়-বড় ঘরগুলো দশ বছরের সারদা ও তাঁর দ্বাদশ বছর বয়সী বড় জা কেই ধুতে-মুছতে হোত। 'কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে' যদিবা ধোয়া হত ছোট ছোট হাতে বড়-বড় ঘর মোছার ন্যাক্‌ড়া ধরতে ও মুছতে ভীষণ কষ্ট হোত। সারাদিন এমন পরিশ্রম করতে করতে যদি কখনো জা-ননদ এমন দু-চার জন সমবয়সী একত্রে বসে খেলা করতেন তাতে শাশুড়ি রাগান্বিত হতেন এবং বালিকাবধূদের কপালে জুটতো বকুনি।[১০] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সারদাসুন্দরীর বিবাহ হয়েছিল সেকালের কলকাতার বিখ্যাত ধনী দেওয়ান রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের সঙ্গে। অর্থ, সমৃদ্ধি, সম্ভ্রান্ততা কোথাও কোন কমতি ছিল না যে পরিবারে সেই পরিবারের বধূর কণ্ঠে যখন এমন বেদনা প্রকাশ পায়, তখন পাঠক হিসাবে বিষণ্ণ লাগে বইকি! আর সঙ্গে আমরা খুঁজতে থাকি, বুঝতে চেষ্টা করি কী ছিল সেই কারণ যে কারণে বালিকাবধূ শ্বশুরবাড়িতে ভয়ে কাঁপতেন, তটস্থ হয়ে থাকতেন? এ কি কেবল নতুন স্থানে, নতুন পরিবারের মধ্যে এসে পড়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও রাগত শাশুড়ির স্নেহভাজন না হতে পারার কারণে? না কি এই ভয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে নারীমনের অপর কোন ভাবনা, সঙ্কোচ? প্রসঙ্গত আমাদের মনে আসে বেগম রোকেয়ার 'গৃহ' প্রবন্ধটি, যেখানে তিনি বড় সহজ সুরে গভীর কথাটি বলে দেন- 'আবাস বিশ্লেষণ করিলে দুই অংশ দেখা যায়- এক অংশ আশ্রয়স্থান, অপরাংশ পারিবারিক জীবন।' তিনি আরও বলেন, সামাজিক অবস্থার দিকে যদি নজর দিলে দেখা যাবে এদেশীয় অধিকাংশ নারী গৃহসুখে বঞ্চিত হয়ে আছেন। অপরের অধীনে থাকা নারীগণ যে বাটীতে থাকেন, তা বৈষয়িক ভাবেও যেমন তাঁর নিজের নয়, সঙ্গে সেই বাড়িকে আপন ভবন মনে করার অধিকারও তাঁদের নেই, এমতাবস্থায় সেই বাটী, সেই গৃহ কী করে নারীর আপন হতে পারে এপ্রশ্ন তো এসেই যায়! সে তো নিজেকে পরিবারের একজন বলে মনে করতেও সাহস আনতে পারে না। কুমারী, সধবা, বিধবা সকল নারীই এই-একই অবস্থার মধ্যেই দাঁড়িয়ে। রোকেয়া তাঁর প্রবন্ধের অন্তিমে বলেন- 'ইংরাজিতে Home বলিলে যাহা বুঝায়, "গৃহ" শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই।...গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটীর নাই। প্রাণি-জগতে কোন জন্তুই

আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে- নাই কেবল আমাদের।'[১১] দশ বছরের বালিকা সারদাকে যখন তাঁর পিতা 'জোর করিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া' কাশীধামে যান তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা বুঝতে পারি সেই বালিকার মনে কী অবস্থা তৈরি হতে পারে, তাঁর অবচেতন মন তাঁকে এটা খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়, 'শ্বশুরবাড়ী ও বাপের বাড়ী এ পাড়া ও পাড়া' হলেও, এতবড় পৃথিবীতে শ্বশুরবাড়ী ব্যতিরেকে তাঁর আর অদ্বিতীয় কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় শ্বশুরবাড়ীতে এসে ক্লান্তিকর উদয়াস্ত পরিশ্রম আর কোথাও এতটুকু চ্যুতি হলে বকুনি। নিজের গৃহের অধিকার এসবের মধ্যে কোথায়? এরই সঙ্গে অতীব ধনী পরিবারে বিবাহও যে সারদার ভীতির কারণ তাও আমরা আলোচ্য আত্মকথাটির মনোযোগী পাঠে বুঝতে পারি।

রামকমল সেনের পরিবারে যে প্রথম থেকে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর চল ছিল না, সারদা আত্মকথাতেই তার প্রমাণ মেলে। ১৮৯২ সালে তিনি যখন নিজের জীবনকাহিনী যোগেন্দ্রলালকে শোনাচ্ছেন তখন বলছেন-'এখন যেমন মেয়েরা স্বচ্ছন্দে লেখাপড়া করিতে পারে, এবং কত ভাল ভাল বিষয় শিক্ষা পায়, আমাদের এ সকল কিছুই ছিল না।'[১২] পরম বৈষ্ণব রামকমল স্বপাকে অন্নগ্রহণ করতেন, কেবল তাঁর চৌদ্দ বছরের বাল্যবিধবা মেয়ে বিন্দুবাসিনীর 'মন ভাল রাখার' উপায় হিসাবে একমাত্র তাঁর সেবা ব্যতীত আর কারোর সেবা গ্রহণ করতেন না। গৃহ কর্ত্তা রামকমল সেন 'কুঠীতে যাইবার সময়' মেয়ের হাতে টাকা দিয়ে 'তোমাতে ও তোমাদের বৌ'য়েতে মিলে আমার জন্য খাবার করো' বলে চলে গেলে পরে অন্তঃপুরিকাগণ 'সমস্ত দিন এই আমোদে' থাকতেন এবং সারাটাদিন বসে খাবার তৈরি করতেন; যা বিকালে গৃহস্বামী রামকমল সেন কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরার পর বড় বড় রূপোর থালায় সাজিয়ে তাঁর কাছে পাঠানো হত এবং যা দেখে 'তিনি অতি আহ্লাদ করিতেন। কিন্তু বিশেষ কিছুই খাইতেন না; কেবল একটু আধটু আহ্লাদ করিয়া খাইতেন।' কেবল সুনিপুণ রন্ধনকলা নয়, 'ধর্মীয় সৎশিক্ষা'ও পেতে শুরু করেছিলেন সারদাসুন্দরী তাঁর শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী রামকমল সেন তাঁর পরিবারের নারীদের কেবল হরিনাম জপের মালা প্রদান, ধর্মীয় উপদেশ দান নয়, ঠাকুরঘরে গিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কী বলে প্রণাম করা হবে সে বিষয়েও পথ প্রদর্শন করতেন। নিজের স্ত্রী এবং অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের উৎসাহিত করতেন ভাগবত পাঠ শুনতে। সেন বাড়ির অন্তঃপুরে মেয়ে-বধূদের জীবন এভাবেই রন্ধন, ঘরের কাজ আর ধর্মশিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা বুঝতে পারি রামকমল সেন তাঁর নিজের ঘর-পরিবারকে যে ভাবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই গড়ে তুলছিলেন তাঁর নিজের কন্যা ও বালিকা বধূমাতাকে। এহেন রাঁধাবাড়া-ধম্মকম্মের দৈনন্দিনতায় পরিপূর্ণ একান্নবর্তী সেন বাড়ির গেরস্থালির মধ্যে সারদার জীবনে লেখাপড়ার আলো এনেছিলেন তাঁর স্বামী প্যারীমোহন। কয়েকটি বাক্যে তাঁর আলোর পথে হাঁটতে শেখানোর দিনগুলোকে তুলে ধরেছেন সারদা- 'তখনকার মেয়েদের আজ কালের মেয়েদের মতন লেখাপড়া শিখিবার এমন সুবিধা ছিল না, শিখিতে চাহিতও না। কিন্তু আমার স্বামীর মত এই বিষয়ে সকল অপেক্ষা উন্নত ছিল। তিনি একান্ত ইচ্ছা করিতেন যে, আমি লেখাপড়া করি। অন্যত্র শিখিবার কোন সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি নিজেই আমায় রাত্রিতে পড়াইতেন। তাঁহার হাতের অক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল, তিনি নিজে লিখিয়া আমায় সেই রকম করিয়া লিখিতে বলিতেন।'[১৩] এই কয়েকটি বাক্যে সারদাসুন্দরী ও প্যারীমোহনের দাম্পত্যে যৌথতার যে ছবি মেলে, তা কর্মক্লান্ত বালিকাবধূর ভীতিপূর্ণ মনোদশার মাঝে অনুভূত হওয়া অনাবিল আনন্দের আস্বাদকেই অভিব্যক্ত করে।

হিন্দু কলেজের 'মেডেল পাওয়া' ছাত্র; 'ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ফার্সিতে অতি পণ্ডিত', সঙ্গীত ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী, সুন্দর ছবি আঁকতে পারা, 'ধর্ম্মে অতিশয় মন', 'দানশক্তি অত্যন্ত অধিক', 'গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি', 'বড় কম কথা বলা', সুদর্শন প্যারীমোহন ছিলেন উনিশ শতকের সেই নব্যশিক্ষিত যুবাদলের প্রতিভূ যাঁরা পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে ঘর, ঘরণী, দাম্পত্যসম্পর্ক নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন। তাঁরা নিজের বিবাহিতা পত্নীদের কেবলমাত্র গৃহের বধূ আর সন্তানের মাতা হিসাবে নয়, পেতে চাইছিলেন নিজের সহধর্মিণী ও মর্মসঙ্গিনীরূপেও। আর সে কারণেই নিজের মনোমত করে পত্নীদের গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা গেছিল তাঁদের মধ্যে। পত্নীকে লেখাপড়া শেখানো, তাঁকে দেওয়া বিবিধ উপদেশও আসলে সেই চেষ্টারই একটা অংশ বটে। প্যারীমোহন-পত্নী বলছেন,-'তিনি সব সময় আমায় উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "যাতে ভাল হও তার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে, কখনও খুব চেঁচিয়ে হাসিও না, কাহারও সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কহিও না", ইত্যাদি। তিনি কখনও বেআব্রু ভালবাসিতেন না, এবং যাহাতে সর্ব্বদা আব্রুতে থাকি সেই জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতেন।'[১৪] একথা অনস্বীকার্য যে, উনিশ শতকের নব্য শিক্ষিত যুবাদল ঘরের মেয়েদের তথা নিজের স্ত্রীকে ঠিক যেভাবে নির্মিত করতে চেয়েছিলেন, যেভাবে তাঁদের দেখতে চেয়েছিলেন উপরোক্ত উপদেশ সেই ছাঁচেই গড়া কিন্তু একথাও বিস্মৃত হলে চলবে না যে, ১৮১৯-এ জন্মগ্রহণ করা ও নয় বছর বয়সে বিবাহ হওয়া সারদাসুন্দরী সংসার করতে শ্বশুরবাড়ী আসেন দশ বছর বয়সে এবং হঠাৎ অসুস্থতায় তাঁর স্বামীর যখন দেহান্ত হয় তখন সারদার বয়স মাত্র উনত্রিশ বছর; তারিখ ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর অর্থাৎ সময়টা হল উনিশ শতকের চারের দশক। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে তখন খ্রিষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে কিছু-কিছু স্ত্রী-শিক্ষার কর্মসূচী গৃহীত হলেছে, বঙ্গদেশের বিবিধ পত্র-পত্রিকা-সভা-সমিতিতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে, ১৮৪৮-এর এপ্রিলে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে সদ্য এদেশে এসেছেন। অর্থাৎ 'ভদ্রঘরের মেয়েদের' কাছে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার মতো ঘটনা তথা ৭মে ১৮৪৯-এ 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'-এর পথচলা শুরু হতে, আরও কিছুটা সময় বাকি আছে। এইসময়ে দাঁড়িয়ে রক্ষণশীল পিতার পুত্র প্যারীমোহন তাঁর স্বল্প জীবনে স্ত্রী সারদার জন্য যেটুকু খোলা বাতাস আনতে পেরেছিলেন তা সমকালের প্রেক্ষিতে নেহাৎ কম নয়। স্বামী প্যারীমোহন যখন স্ত্রী সারদাকে বলেন 'যখন কোথাও যাই, তাহারা যখন তোমার সুখ্যাৎ করে শুনে বড় আহ্লাদ হয়।'[১৫] অপরের মুখে স্ত্রী'র সুখ্যাতি শোনা এবং তা শুনে আহ্লাদিত হওয়া; ঊনবিংশ শতকের দাম্পত্যের সংজ্ঞায় এটি নতুন কথা বইকি! কিংবা জীবনের অন্তিমক্ষণে যখন প্যারীমোহন স্ত্রী সারদাসুন্দরীর পিঠে হাত দিয়ে বলে ওঠেন "তুমি আমার কাছ থেকে যেও না। তোমাকে আমি বড় ভাল বাসিতাম্, এখন তুমিই বা কোথায় রইলে, আর আমিই বা কোথায় চলিলাম।" তখন মননসমৃদ্ধ পাঠক বোঝে এই যন্ত্রণা, এই কাতরতা 'স্বামী দেবতার' নয়, বরং তা সেই স্বামীর যে প্রেমিকও। আর তাই-ই তিয়াত্তর বছরে উত্তীর্ণ সারদাসুন্দরী চুয়াল্লিশ বছর আগের বিচ্ছেদমুহূর্তের শেষ কথাগুলি সারাটি জীবনধরে হৃদয়ের উষ্ণতায় মুড়ে আপন অন্তরের অন্তঃস্থলে সযতনে রেখে দিয়েছেন।

প্যারীমোহনের সঙ্গে সারদাসুন্দরীর উনিশ বছরের যৌথ জীবনে একটা নিবিড় দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠছিল বটে কিন্তু অধ্যাপক সুদক্ষিণা ঘোষের গভীর অভিনিবেশ যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে উত্থাপিত করেছে তা হোল- 'দশ বছর বয়স থেকে অনেক শ্রমে, অনেক ভালোবাসায় যে ঘর গড়ে তুলেছিলেন তিনি- সে ঘর কি সারদাসুন্দরীর নিজের ঘর? এই নিজের ঘরে কোথাও কি স্বীকৃতি আছে স্বামী আর স্ত্রীর যৌথ সম্পদের,

কিংবা আছে কি স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অধিকারবোধের ন্যূনতম চেতনা?'[১৬] আমরা পূর্বে বেগম রোকেয়া লেখা 'গৃহ' প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছিলাম এই অধিকারবোধের প্রসঙ্গেই। অতীব ধনী পরিবারে বিবাহ হওয়া সারদা দেবীর মনে কোথাও অনেকখানি সঙ্কোচ ছিল। যেহেতু তাঁর পিতৃগৃহ আর্থিকভাবে শ্বশুরকুলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, এবং পাছে তাঁর কোন আচরণ সেই অসামঞ্জস্যকেই প্রকট করে এই বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সঙ্কুচিত এবং সচেতন থাকতেন। আর সেকারণেই স্বামীর উপার্জনের 'বাক্সপূর্ণ টাকা' বা 'কোম্পানির কাগজ' কোন বিষয়েই তাঁর নিজের অধিকার আছে বলে মনে করতে আমরা দেখি না। প্যারীমোহন স্ত্রীর হাতে 'থলে থলে নূতন পয়সা, সিকি, দুয়ানি' এনে দিয়ে সারদার হাতে তুলে দিলেও সঙ্কুচিত সারদা কখনোই তা থেকে কিছু চাইতেন না কেননা পাছে 'তিনি মনে করেন, গরিবের মেয়ে, কখনও টাকা দেখি নাই, তাই টাকা চাহিতেছি। এই ভয়ে আমার টাকা লইতে ইচ্ছা হইত না।'[১৭] এই নিবন্ধের শুরুর দিকে বালিকাবধূ সারদার ভয় পাওয়ার প্রসঙ্গে আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, কী কারণে 'রক্ত শুকাইয়া' যাওয়ার মতো ভয় তাঁকে গ্রাস করেছিল? এবং সেখানে একটি কারণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করেছিলাম প্রসিদ্ধ ধনী পরিবারে বিবাহও তাঁর ভয় পাওয়ার একটি অন্যতম কারণ ছিল। জাতীয় চিকিৎসায় যুক্ত সারদাসুন্দরীর পিতা আর্থিক ভাবে যে খুব সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না তা জানা গেছে সারদার কথা থেকেই। আর আত্মকথা থেকে জানতে পারা আরও দু-একটি ঘটনা যা সারদার 'ভয়' কিংবা সঙ্কোচের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বলেই মনে করি- এক, বিবাহের পর সারদাসুন্দরী যখন এক বছর পিতৃগৃহে ছিলেন তখন তখন শ্বশুর রামকমল সেন প্রতি রবিবার তাঁর বধূমাতাকে দেখতে যেতেন এবং বালিকাবধূমাতার জন্য নিয়ে যেতেন 'টাকা ও ট্যাঁকশাল হইতে নূতন রাঙা পয়সা'।[১৮]

দুই, সারদার অনেকদিনের সাধ ছিল ত্রিবেণীতে যাওয়ার যেহেতু তাঁর জন্ম হয়েছিল ত্রিবেণীতে তাঁর মামারবাড়িতে। তিনি বারবার স্বামী প্যারীমোহনকে এই ইচ্ছেপূরণের জন্য 'বিরক্ত করতেন'। যদিও প্যারীমোহন এই 'সাধ পূর্ণ' করেছিলেন এবং 'ত্রিবেণীতে খরচ করিবার জন্য যথেষ্ট টাকা' এবং ননদ ও অন্যান্য লোকজন সঙ্গে দিয়েছিলেন কিন্তু বারবার সারদাসুন্দরীর আব্দার শুনে তিনি বলতেন- 'তোমায় আমি অনেকগুলি কড়ি আনিয়া গুণিতে দিব, তাহা হইলে তুমি ও কথা ভুলিয়া যাইবে।'[১৯] বোধহয় খানিক মজা করেই কথাটি বলতেন, কিংবা ভাবতে ভালো লাগে সারদা ত্রিবেণীতে গেলে স্ত্রীকে অদর্শন জনিত যে বিরহের সম্মুখীন হতে হবে স্বামী প্যারীমোহনের প্রেমিক মন সেই বেদনা স্বীকার করতে চায়নি। তাই হয়ত তিনি এই বিষয়ে খুব উদ্যোগী হচ্ছিলেন না। খানিক মজার ছলে বলা হলেও বাক্যটিতে নিহিত অর্থের এবং পৌরুষের প্রছন্ন অহং কিন্তু পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না।

তিন, সারদাপুত্র কেশবচন্দ্র সন্দেশ ও রসগোল্লা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। ছোটবেলায় কেশব মায়ের কাছে চারটি সন্দেশের জন্য আব্দার করায় মা সারদা দেবী দ্বারা প্রহৃত হন। কেশবের কান্নার শব্দে দাদু রামকমল সেন সেই স্থানে এসে প্রহার ও ক্রন্দনের কারণ শুনে বড়বাজার থেকে বারো ঝুড়ি সন্দেশ আনিয়েছিলেন এবং সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন তিনি প্রতিদিন যথেষ্ট উপার্জন করে আনছেন তাই পৌত্ররা যা খেতে চাইবে তাই যেন দেওয়া হয়।[২০] উপরোল্লিখিত তিনটি ঘটনার মধ্যে যে বিষয়ের সাদৃশ্য আছে তা হোল অর্থ। স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ অর্থ দান, পরিহাসের চিহ্ন স্বরূপ অর্থের উল্লেখ এবং স্নেহের প্রদর্শনস্বরূপ প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থের ব্যায়। অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের মেয়ে সারদাসুন্দরীর কাছে অর্থের এমন বিপুল

প্রদর্শন এবং অকাতরে ব্যায় যে ভীতি তৈরি করবে তা আর অস্বাভাবিক কী, যেখানে পিতৃগৃহ আর শ্বশুরগৃহের মাঝে জীবন কাটিয়ে ফেলা নারীর নিজের, একদম নিজস্ব বলে কোথাও কোন অধিকার নেই।

সারদাসুন্দরীর 'ভয়'খানি যে অমূলক ছিল না সারদার জীবনের কঠিনতম সময় ভীষণ ক্রূরভাবে তা প্রমাণ করে দিয়েছিল। প্যারীমোহনের দেহান্তের পনের দিন পরেই সারদার সেজ দেবর তাঁর উপর অমানুষিক মানসিক অত্যাচার শুরু করেন। ঘরের কপাট ভেঙে প্যারীমোহনের শোয়ার খাট, সিন্দুক খুলে প্যারীমোহনের ব্যবহৃত সমস্ত শাল বের করে নিয়ে চলে যান। পিতৃহারা সন্তানদের নিয়ে শঙ্কিত সারদাসুন্দরী ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতে বাধ্য হতেন মনের মধ্যে এই আশঙ্কায় নিয়ে যে মাথার ওপরের ছাদটুকু তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের থাকবে কি না। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সেকালের প্রসিদ্ধ সেনবাটীর বধূর জীবনে তাঁর স্বামী গত হওয়ার পরে-পরেই পারিবারিকভাবে এই পীড়ন ও আশ্রয়হীনতার ভয়ও পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। আমরা বিস্মিত হই একথা জেনে যে সামাজিকভাবে এতখানি প্রতিপত্তি সম্পন্ন পরিবারের বধূকে তাঁর বৈধব্যদশায় কী চূড়ান্ত আপমান, অপদস্ততা ও অসহায়ত্বের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ক্ষুব্ধ হই একথা পড়ে যে বিধবা বধূমাতার উপর পীড়ন দেখে তাঁর শ্বশ্রূমাতা মাথা খুঁড়ে কাঁদতে থাকেন কিন্তু সেই পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিমোহন সেন; যিনি পিতা রামকমল সেনের অবর্তমানে সেসময় পরিবারের কর্ত্তা, তিনি এই অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ বা প্রতিকার করেন না। মনে হয় দেবর বংশীধরের ন্যায় পরিবারের তৎকালীন কর্তা হরিমোহনও মনে করতেন জীবনের সকল সুবিধার পরিহারই বৈধব্যের যোগ্য কর্তব্য। আর তাই হিন্দু-বিধবার বৈধব্য-জীবনচর্যার অঙ্গ হিসাবে পালঙ্ক পরিত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করেই তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। এই সকল ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরে আমরা বুঝতে পারি কেন প্যারীমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর একজন বিশ্বস্ত খানসামা কাগজপত্রের বাক্স ও প্যারীমোহনের সর্বক্ষণের ব্যবহৃত হীরের আংটি দেওয়ালের গায়ে লুকিয়ে রেখেছিল এবং পরে সারদাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠপুত্র নবীনকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে গেছিল।[২১] আমাদের মনে হয় শ্বশুর রামকমল সেন জীবিত থাকলে এমন মর্যাদাহীন দিন হয়তবা সারদাসুন্দরীকে দেখতে হোত না। এহেন কলুটোলা সেন বাড়ীর অভ্যন্তর চিত্রের সঙ্গে, অষ্টাদশ-উনিশ শতকের বঙ্গীয় মনুবাদী সমাজের হিন্দু পরিবারগুলির বিধবা নারীগণের তলানীতে গিয়ে দাঁড়ানো অবস্থার তফাৎ যে বিশেষ কিছু ছিল না, তা সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়- 'আমাদিগের বিধবাগণের একটী নামই দুর্ভাগা, সুতরাং তাহাদের ভাগ্য যে কেবল দুর্ভাগ্যপূর্ণ, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা কিছু সুখ তাহা হইতে বঞ্চিত না হইলে তাহাদিগের পাপ এবং যাহা কিছু দুঃখ, তাহা অকাতরে বহন করাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিলে মনুষ্যজাতির মধ্যে হিন্দু বিধবাদিগের মত চিরদুর্ভাগ্য, উপেক্ষিত, প্রতারিত এবং অত্যাচারিত জীব আর কেহই নাই।'[২২] সেকালের প্রেক্ষিতে উক্ত কথাগুলি যে কতখানি সত্য, স্বামী বিয়োগের পর সারদাসুন্দরীর অসহায় অবস্থা ও পরিজনের হাতে লাঞ্ছনা তারই প্রমাণ দেয়। প্যারীমোহন চলে যাওয়ার এক বছর পরে গত হয় তাঁর বড় মেয়ে ব্রজেশ্বরী, তার পর শাশুড়ি মা, এরপর বন্ধুসম প্রিয়তমা ননদ বিন্দু- উপর্য্যুপরি শোকে অস্থির-উন্মত্ত হয়ে আর গৃহে থাকতে পারলেন না সারদা। বেরিয়ে পড়লেন তীর্থের উদ্দেশ্যে। এই সময় থেকে সারদাসুন্দরীর জীবনে একটি ভিন্ন পর্বের সূচনা হয় বলেই আমাদের অভিমত।

'...আমার মা আমার বাপের বাড়ী গৌরিভা হইতে গঙ্গাসাগর যাত্রা করিবেন বলিয়া আমাকে দেখিতে আমাদের বাড়ী আসিলেন। তিনি গঙ্গাসাগর যাইবেন শুনিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব স্থির করিলাম।

সকলে নিষেধ করিতে লাগিল। আমি শুনিলাম না। পাছে আমার ভাশুর যাইতে না দেন এই ভয়ে তাঁহাকে জানাইব না মনে করিলাম। চুপি চুপি আমার পায়ের মল বিক্রী করিলাম, শেষে কিন্তু তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি প্রথম বারণ করিলেন, শেষে যখন দেখিলেন যে আমি নিতান্তই যাইব স্থির করিয়াছি, তখন নবীনকে ডাকিয়া বলিলেন, "যদি তোর মা নিশ্চয়ই যান তবে সঙ্গে দারোয়ান এবং লোকজন দিস্, যেন একলা না যান।" আমি শুধু একজন দারোয়ান ও খানসামাকে সঙ্গে লইলাম, এবং কোলের কৃষ্ণবিহারীকে লইয়া মার সঙ্গে যাত্রা করিলাম।'[২৩] --- উদ্ধৃত অংশটি সারদাসুন্দরীকে ও সেনবাড়ীর অভ্যন্তরকে বোঝার জন্য খুব প্রয়োজনীয় বলেই আমরা মনে করি। স্বামী প্যারীমোহন, প্রথম সন্তান, শাশুড়ি ও ননদকে হারানোর পর সারদাসুন্দরীর জীবনে যে তীর্থদর্শন শুরু হয়েছিল, তা চলে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর। প্রথমে তাঁর মায়ের সঙ্গে গঙ্গাসাগর, তারপর শ্রীক্ষেত্র। ক্রমশ কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, বিন্ধ্যাচল, গয়া, জয়পুর, নৈনিতাল, মুসৌরি, লাহোর, লখ্‌নৌ, অমৃতসর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দেরাদুন প্রমুখ স্থান সারা জীবনধরে দর্শন করেছিলেন তিনি। এই তীর্থদর্শনের সূচনাটা যে সেনবাড়ীর অন্তঃপুরিকার জন্য বড় সহজ ছিল না উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি তার প্রমাণ। দশ বছর বয়সী যে বালিকাবধূ সারদা শ্বশুরবাড়িতে এসে ভয় পেতে আরম্ভ করেছিলেন, তিন সন্তানের মা হওয়ার পরেও যাঁর ভীতি কাটেনি, যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরের অমানুষিক ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ করতে পারেননি, শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি বন্টনে তাঁর পিতৃহীন পুত্রদের প্রতি আর্থিক বঞ্চনা ও অসাম্য হচ্ছে দেখেও কিছু বলতে সমর্থ হননি, স্বামী ও কন্যার মৃত্যুর ভীষণ শোকের পর যখন তিনি 'উঠিতে পর্য্যন্ত অক্ষম' সেই সময় তাঁর মতামতের মূল্য না দিয়ে বড় ছেলে নবীনের বিবাহ স্থির করা হলে যিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি; সেই সারদাসুন্দরীকেই আমরা তীর্থযাত্রার ক্ষেত্রে নিজের দৃঢ় মতামত ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে দেখি। শুধু তাই নয়, ভাশুর খরচবহন করতে অরাজি হলে নিজেই নিজের খরচে গঙ্গাসাগর যাবেন এই নির্ণয়ে, মনের মধ্যে ভীতি নিয়েই পায়ের মল বিক্রি করেন তিনি। আত্মকথার মাধ্যমে এপর্যন্ত জানা সারদার সঙ্গে এই সারদাসুন্দরীর কেমন যেন আন্তর প্রভেদ অনুভূত হয়। এরই সঙ্গে চোখে পড়ে তাঁর বলা বাক্যের '...আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব স্থির করিলাম' কিংবা 'আমি নিতান্তই যাইব স্থির করিয়াছি...' এই অংশগুলি। এই 'স্থির' করাটুকুই যে অন্তঃপুরিকার পক্ষে নিতান্ত কঠিন। উনিশ শতকের রক্ষণশীল পারিবারিক-ভূমিতে দাঁড়িয়ে, পরিবারতন্ত্রের গোঁড়ামিকে পেরিয়ে, স্বামীহীন নারীর পুরোপুরিভাবে শ্বশুরকুলের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল থাকা অবস্থায় এই কাঠিন্য যে আরও শতগুণ বেড়ে যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই কাঠিন্যকে পেরিয়ে যেতে পারার ক্ষণই অন্তরালবর্তিনী সারদার বৃহত্তর জীবনবোধের সূচনাবিন্দু বলে আমরা মনে করি। কেননা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, নারী মুক্তির পথে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা নারীর দেশ-বিদেশ ভ্রমণের সূচনা হবে আরও কিছুটা পরে, ১৮৬৯-৭০ সাল নাগাদ। আর সারদাসুন্দরী তীর্থদর্শনে বেরচ্ছেন কিন্তু আরও বেশ খানিকটা, অন্তত আরও প্রায় দু'দশক আগে।

পরপর পাওয়া শোকের আঘাত থেকে সান্ত্বনা পেতে সারদাসুন্দরী 'পাগলের মত হইয়া বাহির' হয়েছিলেন তীর্থের পথে। মায়া কাটাতে শুরু করা তীর্থযাত্রা কখন 'প্রাণে যে কি এক অপূর্ব্ব আহ্লাদ'-এর সঞ্চার করেছিল সারদাদেবী বোধহয় বুঝতেও পারেননি। যখন নিজের ভিতরে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন তখন বলেছেন তিনি তীর্থ করেন পুণ্যলাভ হবে বলে নয়, বরং 'ভালবাসার উপর তীর্থ দর্শন' করেন। তিনি যেমন ছেলেপুলে এবং আপনার লোকদের ভালোবাসেন, সেইরকম ভাবে তীর্থ, ব্রত ইত্যাদিকে ভালোবাসেন। এগার বছর বয়সে শ্বশুরমশাই রামকমল সেনের মাধ্যমে পাওয়া হরিনামের মালা

গ্রহণ করা কলুটোলা সেনবাড়ির পুত্রবধূ সারদাকে এই প্রতীতিতে উন্নীত হতে পার করতে হয়েছে জীবনের অনেকটা কঠিন পথ। যেপথে আচারবতী হিন্দু-বিধবা নিজের সকল ধর্মীয় আচরণ নিষ্ঠাভরে পালন করলেও কাটিয়ে উঠেছেন ধর্মীয় সংকীর্ণতা। সে কারণেই পুত্র কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম হওয়ার কারণে তিনি পারিবারিক নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করলেও পুত্রকে কখনোই তাঁর নিজের বিশ্বাস ও ধর্মের পথ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেননি। বরং কেশবচন্দ্রের দেওয়া ধর্মীয় বই ও কাগজপত্র পাঠ করে তা সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য গুরুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। গুরু আশ্বস্ত করার জননীর মন সন্তোষ লাভ করে। কেশব চরিতকার বলেন- 'কেশবের প্রথম জীবনে জননী একজন তদীয় ধর্ম্মপথের উত্তরসাধিকা ছিলেন।...কেশবচন্দ্র সেই বৃহৎ হিন্দুপরিবারের মধ্যে তখন কেবল জননীকে ধর্ম্মপথের এক মাত্র সহায় প্রাপ্ত হন।'[২৪] কেশবচন্দ্র যখন সস্ত্রীক দেবেন্দ্রনাথের গৃহে যান তখন পরিবারের অন্যান্যরা কেশবকে ত্যাগ করলেও মাতা সারদাসুন্দরী তা করেননি। এমনকি কেশবচন্দ্র যখন তাঁর প্রথম পুত্র করুণাচন্দ্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম অনুসারে কলুটোলার বাড়িতেই সম্পন্ন করার জন্য সংকল্প করলেন সেই অনুষ্ঠানের দিন 'বহুজন-পূর্ণ কলুটোলার ভবন একেবারে শূণ্য হইয়া' গেলেও 'কেশব জননী অনুষ্ঠানক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন'। কেশব চরিতকার লেখেন-'এমন উদারচরিত্র হিন্দুধর্ম্মপরায়ণা নারী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়া তিনি চিরদিনই পুত্রের সদঅনুষ্ঠানে যোগ দিয়া আসিয়াছেন।...অথচ তিনি এক জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিনী।'[২৫] একদিকে পুত্র কেশবের সকল অনুষ্ঠানে ভক্তিপূর্ণভাবে যোগদান ও অপরদিকে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজধর্মের ব্রত, পূজা, তীর্থদর্শন প্রমুখ আচরণাদি পালন; পরস্পর সমান্তরালে এমন দ্বৈত ধর্মসমন্বয়ের জীবনই যাপন করছিলেন কেশবজননী। ধর্মের সার বুঝেছিলেন বলেই হয়ত ধর্মীয় জীবন তাঁকে সংস্কারাচ্ছন্ন না করে কখনো 'আমোদে মত্ত', কখনোবা 'আহ্লাদিত' রেখেছিল। এগার বছরের বালিকাবধূর হাতে কূলধর্মের পালনহেতু যে হরিনামের মালা উঠেছিল, শোকসন্তপ্ত নারীর দেবদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে পা রাখার মাধ্যমে সেই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে বোঝা শুরু হয়েছিল। আর সেই পথে চলতে-চলতে তিয়াত্তর বছরের মহিলা এই উপলব্ধিতে এসে পৌঁছান যে- 'আমার প্রাণের বিশ্বাস এই যে, এক ঈশ্বর এবং তাঁহার উপাসনা ভিন্ন আমার মুক্তি নাই। মানুষ যে সাকার উপাসনার দ্বারা মুক্তি পায় না, এই কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না। নিরাকারের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয়-ইহা আমি জানি এবং আমার নিজের মুক্তিও নিরাকারের উপর নির্ভর করিতেছে।' তিনি তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি পালন করেন ঠিকই কিন্তু এর মাধ্যমে যে তাঁর পরিত্রাণ হবে তা তিনি মনে করেন না। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন 'মন ঠিক এবং খাঁটি না করিতে পারিলে মানুষের পরিত্রাণ হয় না। পরিত্রাণের জন্য জীবন ভাল চাই।'[২৬] আমাদের মনে হয় সাকার এবং নিরাকারের সম্মিলনেই তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের উপলব্ধি এবং এই তাঁর একেবারে নিজস্ব ধর্মমত।

সময় এগোয়। যে বালিকাবধূ সারদাসুন্দরী আত্মকথার সূচনায় পাঠকের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি মিলিয়ে যেতে থাকেন আর সেস্থানে এসে দাঁড়ান একজন পরিণত রমণী; কন্যা-জামাতা-পুত্র-পুত্রবধূ-পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রী প্রভৃতি নিয়ে যাঁর পরিপূর্ণ সংসার। প্রশ্ন জাগে, কলুটোলা সেন বাড়ী, সেবাড়ির অন্তঃপুরে কি সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে কোন পরিবর্তনের রঙ লেগেছিল? ব্রজেশ্বরী, নবীন, ফুলেশ্বরী, চুণী কোন বিবাহেই কি পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে, কি বিবাহ বিষয়ে কোথাওই জননী সারদা দেবীর মতামতের কোন স্থান দেখা যায় নি। কিন্তু ছোট মেয়ে পান্নার বিবাহে সর্বপ্রথম তাঁর মতামত অনুযায়ী বিবাহ হয়। তাঁর নিজের কথায়- '...এই বিবাহ আমি নিজেই দিয়াছিলাম। টাকাকড়ি অবশ্য ভাশুরের হাতে ছিল, তিনিই সব খরচ পত্তর করিয়াছিলেন, কিন্তু পছন্দ করিয়াছিলাম আমি।...এই বিবাহে খরচপত্রের কোনও

অভাব হয় নাই।'[২৭] কিন্তু কেশবের বিবাহ সারদার মনোমতো হয়নি। পাত্রীর রূপ ও শারীরিক গঠন সম্বন্ধে মনোমতো খবর না পেয়ে এতটাই মনখারাপ হয়েছিল তাঁর যে তিনি বিবাহের পর বধূমাতার মুখ দেখার আগেই কেঁদে ফেলেছিলেন। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে চিরকাল নারীর প্রাথমিক বিচার হয়েছে তার রূপ দিয়ে। আর সেকালে যে তা-ই হবে, এতো সর্বজ্ঞাত। কূল, রূপ, গড়ন এই ছিল মেয়েদের প্রাথমিক বিচারের মাপকাঠি। আর তাই সুন্দরের যে মান সমাজ নির্দিষ্ট করেছে ছেলের বৌ যদি সেই মানে উত্তীর্ণ হতে না-ই পারলো তাহলে আর কী হোল! কেশবের বিবাহ ও বিবাহকালে কেশবপত্নীর রূপহীনতা বিষয়ে তিনি বলেন-'...বৌ এত রোগা ও ছোট ছিলেন যে, কেশব যদি মন্দ ছেলে হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বভাব নিশ্চয়ই মন্দ হইয়া যাইত...'।[২৮] অস্বীকার করার জায়গা নেই এই বাক্য যে চিন্তাপ্রসূত তা আসলে অত্যন্তভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। যুগ-যুগ ধরে ঘরে-পরিবারে অসংখ্য নারীর মধ্যেই এই চিন্তা লালিত হয়ে এসেছে এবং এরূপ ভাবনাকে লালন করতে দেখা সারদার মননও এই চিন্তাকেই বহন করতে শিখেছিল। সারদাসুন্দরীর ছোট ছেলে কৃষ্ণবিহারী নিজের পছন্দমত মেয়েকে বিবাহ করতে চাইলে প্রাথমিকভাবে সারদার অমত ছিল, কেননা পাত্রীর পরিবার ছিল কুলের দিক থেকে সেন পরিবারের থেকে নিম্ন। কিন্তু কৃষ্ণবিহারীর কারণে সারদা এই বিবাহে মত দেন এবং ভাশুরকেও 'অনেক সাধ্য সাধনা' করে রাজী করান। সারদার কাছে এটা ছিল একটা নতুন রকম বিয়ে। কিন্তু বিবাহের পর বৌ-এর অপরূপ সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলে যে বিয়েতে অসমকুল একটি সমস্যাজনক বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল, তা আর রইলো না। কৃষ্ণবিহারীর বিবাহ প্রসঙ্গে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করবো- (১) রক্ষণশীল কলুটোলা সেন বাড়িতে অনুলোম বিবাহ সম্পন্ন হোল। (২) এই বিবাহের পর হিন্দুধর্মাবলম্বী সারদা তাঁর বৌমাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে কেশবচন্দ্রের কাছে দীক্ষিত করালেন। বলাই বাহুল্য, এই মন্দির ব্রাহ্মমন্দির এবং এই দীক্ষা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা। আমরা বুঝতে পারি কী ভাবে কেশব ও কৃষ্ণবিহারীর কারণে তাঁদের জননীর অন্তরের ধর্মীয় ভাবনায় ধর্মসমন্বয়ের রঙ পাকা হয়ে ধরেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কলুটোলার অন্তঃপুরেও যে অনেক পরিবর্তন আসছিল সারদাসুন্দরীর আত্মকথায় তার টুকরো-টুকরো ছবি ধরা পড়েছে। যে পরিবারে নারীশিক্ষার কোন চল ছিল না, এমনকি পরমবৈষ্ণব হয়েও বাড়ির প্রধান রামকমল সেন বৈষ্ণবীদের দিয়ে অন্তঃপুর শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন বলে কোন তথ্য মেলে না; যার চল সেকালে অনেক বাড়িতেই (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি) ছিল, যে পরিবারের নারীর পড়াশোনার কথা জানা যায় হিন্দুকলেজের ছাত্র প্যারীমোহনের রাতে নিজের ঘরে স্ত্রী সারদাসুন্দরীকে পড়ানোর তথ্যে, সেই পরিবারের সন্তান সারদাসুন্দরীর কনিষ্ঠপুত্র কৃষ্ণবিহারীকে দেখা যায় বাড়ির বারাণ্ডার স্কুল করে বাড়ির বৌদের পড়াতে। জীবনে অনেক কষ্ট নীরবে সহ্য করা কৃষ্ণবিহারী রক্ষণশীল সেন পরিবারের অন্তঃপুরিকাদের জন্য শিক্ষার আলো জ্বালানোর প্রয়াস করেছিলেন। এবং তাঁর এই প্রচেষ্টা যে সকল বয়সের পুরনারীদের জন্যই ছিল তার প্রমাণ মেলে কৃষ্ণবিহারী-জননীর কথায়- 'বৌরা এক এক সময় ঠাট্টা করিতেন যে, "তোমাকে আমরা হাতে করে মানুষ করিলাম, আবার তোমার কাছে পড়িব!" আবার বৌরা তাঁকে মাষ্টার মাষ্টার বলিয়া ডাকিতেন।'[২৯] সেনবাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া শুরু হয়। কেশব কন্যা সুনীতি সম্পর্কে আমরা জানি তিনি প্রথমে তাঁর পিতার কাছে, পরে 'ভারত আশ্রম'-এর বিদ্যালয়ে ও কিছুসময় বেথুন কলেজে এবং তারপর বাড়িতেই ইউরোপীয় শিক্ষিকার কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। যদিও ব্রাহ্মধর্মী কেশবচন্দ্র অনেকটা আগে থেকেই কলুটোলা ছেড়ে অন্যস্থানে সপরিবারে থাকতে শুরু করেছিলেন কিন্তু তাও কলুটোলাই যে তাঁর শিকড় এবং তা যে তিনি বিস্মৃত হননি তা কন্যা সুনীতির বিবাহের সময়

কোচবিহার থেকে কলুটোলার বাড়িতে 'জুড়ুনি' (জুড়নী- বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হলে বরের বাড়ি থেকে কন্যার বাড়ীতে প্রেরিত বস্ত্র অলংকার প্রভৃতি উপহার। সূত্র : বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) আসা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গেই বোঝা যায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও ক্রমশ জাতপাতের কড়াকড়ি আলগা হতে দেখা যায় সেনবাড়ীতে। কৃষ্ণবিহারী সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমুদবিহারী সেন বিবাহ করেন সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের দাদা যোগেশচন্দ্র দত্তের মেজ মেয়ে সরযূবালাকে এবং কেশবচন্দ্র সেনের সেজ ছেলে ব্যারিস্টার প্রফুল্লচন্দ্র সেন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মিস্ রাইসের সঙ্গে। এই দুই বিবাহ প্রসঙ্গেই সারদাসুন্দরী বলেছেন প্রথমে তাঁর মনে বড় কষ্ট হয়েছিল কিন্তু বিবাহের পরে 'ক্রমে ক্রমে বৌদের গুণ দেখিয়া' তিনি মোহিত হয়ে গেছিলেন। লক্ষ্যণীয়, এবার কিন্তু সারদাসুন্দরী উল্লেখ করলেন কেবলমাত্র 'গুণ'-এর, রূপের নয়। প্রসঙ্গত আমরা দেখে নেবো সারদাসুন্দরী তাঁর পুত্রবধূদের বিষয়ে কী বলছেন- 'বৌরা সব ভাল। আমার সন্তানেরা সব ভাল ছিলেন, বৌরা পরের মেয়ে, আমার ছেলেদের সঙ্গে একত্র হইয়া তাহাঁদের গুণে সমস্ত ভাল হইয়া গেলেন...।'[৩০] লক্ষ্যণীয়, তিনি কিন্তু বলছেন তাঁর সন্তানদের গুণে তাঁদের স্ত্রীগণ গুণান্বিত হয়েছেন। যেহেতু ছেলেরা ভালো, তাই সেই ভালোর সঙ্গে একত্র হয়ে বৌমাদের ভালোত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, সন্তান গরবে গরবিত বাৎসল্যময়ী জননীর কণ্ঠস্বর এটি যার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে সমাজের মৌলিক পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাপ্রক্রিয়া। কিন্তু আমরা এও দেখি আবার তিনিই মুক্তকণ্ঠে পৌত্রবধূদের গুণের প্রশংসা করেন এবং সেই গুণে পৌত্রদের কোন অবদান আছে এমন কথা কিন্তু তাঁর মুখে শোনা যায়না। আসলে দীর্ঘজীবন লাভ করা সারদাসুন্দরীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল একেবারে বাল্যকালে ও মায়ের কাছে ব্রত-পার্বণ করতে শিখে শ্বশুরবাড়ি আসা সারদা তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী যা যা শিখেছেন সেসবেরই সূচনা হয়েছে স্বামীর কাছ থেকে বা স্বামীগৃহে এসে। তাঁর পুত্রবধূদের ক্ষেত্রেও সবারই বাল্যে বিবাহ এবং বাকি শেখা-জানার ক্ষেত্রেও সারদার থেকে খুব বিপ্রতীপ কিছু ঘটেনি। কিন্তু সময়ের বদলের রেশ এসে পড়েছিল তাঁর পৌত্রবধূদের ক্ষেত্রে। আট-নয় বছরে বিবাহ তাঁদের ঘটেনি, তাঁরা লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছিলেন পিতৃগৃহেই আর সঙ্গে সমাজ নির্ধারিত নানাবিধ 'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা'য়ও হয়ে উঠেছিলেন নিপুণ। ফলতঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ক্রমশ বঙ্গদেশ জুড়ে নারীর শিক্ষা ও নারীপ্রগতি বিষয়ে নবতর চিন্তাভাবনার সূচনা এবং তার ফলাফলে 'নতুন নারী'দের গড়ে ওঠা; সারদাসুন্দরীর আত্মকথায় সেই সামাজিক ইতিহাসেরই রূপই দৃষ্ট হয়েছে পারিবারিক ছাঁচে। নাতবৌ প্রসঙ্গে তিনি বলেন কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র করুণাচন্দ্র সেনের বিবাহের কথা। করুণার সঙ্গে বিবাহ হয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীরের দ্বিতীয় কন্যা মোহিনীর। তিনি জানান, মোহিনী বয়সে করুণাচন্দ্রের থেকে বড় হওয়ায় কেশবপত্নীর এই বিবাহে মত ছিল না কিন্তু সারদাসুন্দরীর প্রথম থেকেই মত ছিল। খেয়াল রাখতে হবে বিবাহে স্বামীর থেকে স্ত্রী বয়সে বড়, এই ঘটনা ঘটছে কলুটোলা সেন পরিবারের মতো রক্ষণশীল পরিবারে এবং তার সময়কাল উনিশ শতক; যে সময় বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র এবং কন্যার বয়সের ব্যবধান বিষয়ে কন্যার তুলনায় পাত্রের বয়সের ব্যবধান চতুর্গুণও খুব স্বাভাবিক বলেই মনে করা হোত। শুধু বয়সের ক্ষেত্রে নয়, এই বিবাহে আমরা দেখি পাত্রীর মতামতও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মোহিনীর অন্যত্র সম্বন্ধ এসেছিল যেখানে বিবাহ করলে 'সে রাজসুখে থাকিতে পারিত' কিন্তু মোহিনী তাঁর বাবার অমতেই কেশবপুত্রকে বিবাহ করে। বিবাহের ক্ষেত্রে বাড়ির বধূর পাত্র নির্বাচন এবং মতদান এই পরিবারের প্রেক্ষিতে একান্ত নতুন ঘটনা। এছাড়াও কেশবজননীর আত্মকথায় উল্লেখিত হয়েছে কুচবিহার বিবাহপ্রসঙ্গ। তিনি উপস্থিত ছিলেন সেই বহু আলোচিত বিবাহে এবং এমন বিতর্কিত বিষয়ে যেটুকু বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেখানে তাঁর সত্যনিষ্ঠা অবিসংবাদিত- '...গায়ে হলুদ

হইয়া গেল। তখন মহারাণীর বয়স তের বৎসর ছয় মাস।...কেশবের মত কেশব উপাসনা করিয়া রাজারাণীর বিবাহ দিলেন। রাজাকে এনে ওরা আবার হোম ইত্যাদি করিয়াছিল, যদি রাজা হোমটী না করিতেন, তবে এইটীকে খাঁটী ব্রাহ্মবিবাহ বলা যাইত। ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইয়া যাইবার পরেই রাণীকে তুলিয়া আনা হইয়াছিল। বিবাহের পর রাজা যে হোম করিয়াছিলেন, রাণী তাহাতে একেবারে যোগ দেন নাই। আমরা বিয়ের দুই দিন পরেই রাণীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি।...আমরা যে দিন এখানে আসি, তার পরদিনই মহারাজা বিলাত চলে গেলেন। রানীর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।'[৩১] কোচবিহার বিবাহের প্রসঙ্গে সুনীতি দেবীর বোন ময়ূরভঞ্জের মহারাণী কেশবকন্যা সুচারু দেবীর তথ্যানুযায়ী নতুন বিবাহ আইন (Act III of 1872) অনুযায়ী পাত্র ও পাত্রীর বয়স কম থাকায় কেশবচন্দ্রের শর্ত অনুযায়ী বিবাহ হলেও তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া অবধি এই বিবাহকে বাগ্‌দানের মতো ধরা হবে বলেই স্থির হয়েছিল এবং এই শর্তে তাঁদের পৃথক থাকার ব্যবস্থা হয়। মহারাণী চলে আসেন কলকাতায় এবং মহারাজা উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিলাত থেকে ফিরে আসেন এবং ১৮৮০ তে 'দুজনেই প্রাপ্ত বয়স্ক হলে, কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে তাঁদের বিবাহ-পরিপূরক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ও তাঁরা একত্রে কুচবিহার যান।'[৩২] আগস্ট ১৯০০ তে সারদাসুন্দরী তাঁর জীবনকথা বলতে গিয়ে যখন উক্ত বিবাহ প্রসঙ্গে কথা বলেছেন তখন 'বাগ্‌দান' বা 'বিবাহ-পরিপূরক অনুষ্ঠান' সম্পর্কে কোন তথ্য না দিলেও 'রাত্রে বিয়েতে বড় গোল' হয়েছিল তা জানাতে দ্বিধা করেননি এবং 'এই বিবাহের জন্য কেশব যাহা সহ্য করিয়াছেন, লোকে তাহা পারে না। যে উদ্দেশ্যে কেশব এত সহ্য করিলেন, কুচবিহার রাজ্যে তাহা পূর্ণ হোক্।'- একথা বলে কুচবিহার বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁকে নিশ্চুপ হতে দেখা যায়।

এই নিবন্ধের সূচনায় আমরা দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম আত্মকথার অনুলিখনকার যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীরের কেন বলেছিলেন সারদা দেবীর নিজের জীবনী তাঁর নিজের সম্পত্তি নয় এবং সহস্র বৎসর পরে জগতের লোক কেনইবা তাঁকে খুঁজবে? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সারদাসুন্দরীকে বলেছিলেন- "দ্যাখ্ মা, তোর যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচ্‌বে। তোর ঐ ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।"[৩৩] কেশব অনুগামী নববিধান প্রচারকগণের মতামত অনুযায়ী কেশবজননী সারদাসুন্দরী সতী, সাধ্বী, পরসেবানুরক্তা, স্নেহ মধুর প্রকৃতি, ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, সেবানুরাগ, লজ্জা, ভয়, সরলতা, বিশ্বাস, দয়া, দাক্ষিণ্য, সেবা প্রভৃতি 'আদর্শ মহিলা'র বিবিধগুণে পরিপূর্ণ ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ মনে করেছিলেন বিবিধ সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ আচার্য্যমাতার জীবনী সকল বঙ্গীয় মহিলাকুলের জীবন গঠনে, বিকাশে ও উন্নত জীবন গড়ে তুলতে বিশেষ সহায়ক হবে। এবং কেশবচন্দ্র সেন মুক্তকণ্ঠে একথা ঘোষণা করেছিলেন তাঁর যা কিছু ভালো তা তাঁর মায়ের গুণে। প্রচারকগণ বিশ্বাস করতেন 'আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উন্নত জীবনের মূলে তাঁহার সাধ্বী জননী সারদা দেবী বিদ্যমান' এবং তাঁদের কাছে ঈসা-মাতা মেরী এবং গৌরাঙ্গ-মাতা শচী দেবীর সঙ্গে সমাসনে আসীন ছিলেন কেশব-মাতা সারদাসুন্দরী। কেশবজননীর আশীর্বাদ স্বয়ং 'পরম মাতার আশীর্বাদ বলেই মনে করতেন নববিধানের প্রচারকগণ। সুতরাং আচার্য জননীর জীবনী আচার্য্যদেবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা ব্রাহ্মদের মতে, 'আদর্শ জননী' ব্যতীত সুসন্তান গড়ে ওঠে না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে সমাজ সংস্কারকদের দ্বারা 'আদর্শ পরিবার' গঠনের যে প্রকল্প নেওয়া হয় তার কেন্দ্রে ছিল নারী ও শিশু এবং সেই পরিবার তৈরি হবে জাতীয়তাবাদী আদর্শে। এই

পরিবারে সন্দর্ভে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল নারী কী ভাবে 'আদর্শ জননী' হয়ে উঠবে, কীভাবে সে তার সন্তানকে পালন করবে, কীভাবে তাকে ভবিষ্যৎ-এ দেশের উপযোগী করে তুলবে প্রভৃতি বিষয়গুলি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্রাহ্মধর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত, প্রচারিত ও নিয়ন্ত্রিত পত্রিকাগুলিতে লেখালিখি করা হয়। কেননা বঙ্গদেশে তখন নতুন জাতীয়তার ঊষাকাল এবং এই কালে জননীকেই হয়ে উঠতে হবে নতুন জাতীয়তার প্রতিনিধি, যাঁর মাধ্যমে 'ঘরে ঘরে সুসন্তান হইতে পারে এবং তাহা হইলেই সমাজের ও দেশের মুখোজ্জ্বল হইতে পারে।' কেশবজননী সারদাসুন্দরী ছিলেন তেমনই একজন 'আদর্শ মাতা' যাঁর 'সুদৃষ্টান্তে সত্যনিষ্ঠা ভক্তি প্রেম বিশ্বাস পবিত্রতা আত্মস্থ করিয়া উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ' করেছেন কেশবচন্দ্র এবং দেবত্ব লাভ করে ধর্মজীবনে বর্ধিত হয়েছেন। মায়ের সাহায্যেই তিনি তাঁর নতুন সমাজকে জাতীয় ভাব এবং নতুন জাতীয়তার শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। নববিধানের সকল জাতীয় অনুষ্ঠান পালনে ও নবধর্মের সকল অনুষ্ঠানে হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান ও হিন্দুআচারসম্পন্না সারদাদেবীর সংশয়শূণ্য উপস্থিতি 'নতুন জাতীয়তায়' জননীর ভুমিকাকে আরও প্রোজ্জ্বল করেছিল। এহেন মাতার জীবনকে কী ভাবে তাঁর নিজের সম্পত্তি রাখতে দিতে পারেন কেশব অনুগামী ও ভক্তগণ! যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ জানিয়েছেন- 'সারদাদেবী যখন এ জীবনী বলিতেন এবং আমি যখন ইহা লিখিতাম, তখন আমি ইহাকে একটি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করিতাম, এবং সমসাময়িক সমুদায় লোককে ভুলিয়া সহস্র বৎসর পরে নববিধানাশ্রিত লোকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতাম; সারদাসুন্দরীকে ঠাকুরমা না মনে করিয়া কেশবজননীরূপে দেখিতাম, আমি নিজেকে সহস্র বৎসর পরের কেশবপন্থী বলিয়া মনে করিতাম।'[৩৪] সুতরাং আমরা বুঝতে পারি, কেন কেশবজননীর 'যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচ্‌বে' কিংবা কেন সারদা দেবীর নিজের জীবনী তাঁর নিজের নয় এবং সহস্র বৎসর পরে জগতের লোক কেনইবা তাঁকে খুঁজবে। আচার্য্যজননীর আত্মকথা কেবল 'বঙ্গমহিলার হিতার্থে নয়' উপরন্তু নববিধান প্রণেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনকে জানতে, তাঁর ধর্ম ও ধর্মপথের যাত্রাকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানস্বরূপ। আচার্য্য দেবের 'বড্ড ভাল মা'র জীবনীপাঠে যাতে একদিকে বঙ্গমহিলাগণ ও জগজ্জন 'ব্রহ্মানন্দ রত্ন-প্রসবিনী দেবী মা সারদার' দেবত্বের সম্যক পরিচয় পান এবং অপরদিকে ব্রহ্মানন্দ জীবন নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হন, সেকারণেই নববিধান প্রচারকগণের সক্রিয় আগ্রহে ও উৎসাহে এই আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৮১৯ থেকে ১৯০৭- দীর্ঘ অষ্টাশি বছরের জীবন সারদাসুন্দরীর। দীর্ঘ জীবনে যেমন তিনি পরিপূর্ণ পরিবার পেয়েছেন তেমনই হারিয়েছেন প্রায় সকল প্রিয়জনকেই। স্বামী-সাত সন্তান একে-একে চলে গেছিল তাঁর চোখের সামনেই। পরমেশ্বররের কাছে 'মুক্তি' চেয়েছিলেন সারদা আর সেই মুক্তি পাওয়ার পথে তাঁকে 'মায়া' কাটাতে হয়েছিল সকল প্রিয়জনদের হারিয়ে। তবে নানাবিধ জীবনযন্ত্রণায় এই দীর্ঘজীবন পথে চিরকালই তিনি থেকেছেন জীবনের প্রতি আস্থাশীল। সহজ ধর্মজীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মের সত্যস্বরূপ। আর তাই যে কলুটোলার সেন বাড়িতে কেশবপুত্রের ব্রাহ্মমতে জাতকর্ম অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে লোকে পরিপূর্ণ বাড়ি শূণ্য হয়ে গেছিল, সেই বাড়ির পুত্রবধূ হিন্দু আচারসম্পন্না সারদাসুন্দরীর দেহান্তের পরে তাঁর নশ্বর শরীর তাঁরই ব্রাহ্ম ও হিন্দু আত্মীয়গণের দ্বারা বাহিত হয়ে শ্মশানভূমিতে যায় এবং হিন্দু পৌত্রগণ হিন্দুমতে এবং ব্রাহ্ম পৌত্রগণ নবসংহিতা মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। সমন্বয়ের এমন রূপ স্থাপনই যেন ছিল সারদাসুন্দরীর জীবনের বীজমন্ত্র; যা তিনি জপে গেছেন তাঁর সমস্ত জীবনজুড়ে করা যাপনের মাধ্যমে এবং মৃত্যুতেও সেই যাপনেরই স্বীকৃতি তিনি

পেয়েছেন সসম্মানে। কলুটোলা সেনবাটীর একান্নবর্তী পরিবারের অন্তিম চিহ্নবাহী সেনবাটীর এহেন পুত্রবধূ সারদাসুন্দরীই তাই বলতে পারেন- 'আমার শ্বশুর দেওয়ান রামকমল সেনের পরিবার শুদ্ধ একত্র করলে সমুদায় পরিবারে প্রায় ২০০ শতেরও অধিক লোক হইবে। আমার নিজের পরিবারও প্রায় ১০০ শত। এই বৃহৎ পরিবারে প্রতিদিন কোন স্থানে শোক দুঃখ, কোনও স্থানে বা আনন্দোৎসব হইতেছে। এই সমস্ত শোক, দুঃখ, আনন্দোৎসবের খবর প্রায় রোজই আমার নিকট আসিতেছে। ভগবান আমাকে একেবারে আনন্দে কিম্বা একেবারে দুঃখে থাকিতে দিতেছেন না। সুখে এবং দুঃখে তিনি আমায় পোড়াইতে পোড়াইতে সুখ দুঃখের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। আমার এক অংশ যেমন রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী, আর এক অংশ গৃহশূণ্য-অর্থহীন, প্রায় পথের ভিখারী, সুতরাং সুখ সংবাদেও আমি উতলা হই না এবং দুঃখের সংবাদেও আমাকে কাতর করিতে পারে না। এই সমস্ত লীলাময় হরির খেলা মনে করি, এখন আমি এই প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে বসিয়া, ভাই, এক চোখে হাসি আর এক চোখে কাঁদি।'[৩৫]- এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির অবতারণ তিয়াত্তর বছরের সারদাসুন্দরীর যাপনে এরূপ সমন্বয়ের অনুভূতি ও তাকে অতিক্রম করে তাঁর নির্লিপ্তিতে উত্তরণকে উপলব্ধি করার জন্য। কেশবঅনুগামীদের কাছে সারদাসুন্দরীর আত্মকথা লিখনের উদ্দেশ্য আচার্য্যমাতার 'সুন্দর চরিত্র জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করা' হলেও এই আত্মকথার ভিতর থেকে প্রকাশ পাওয়া সারদাদেবী আমাদের কাছে কেবলমাত্র কেশবজননী নন। বিবাহসূত্রে সেন পরিবারের সঙ্গে আবদ্ধ হওয়া সারদা দেবীর দীর্ঘজীবন সাক্ষ্য থেকেছে ঘরে-বাইরে সময়ের পালাবদলের। রামকমল সেন থেকে শুরু করে করুণাচন্দ্র সেন অবধি ঘরের কথা, ঘরের বিবর্তনের কথা চিত্রায়িত হয়েছে তাঁর আত্মকথার আখরে এবং কলুটোলার সেনবাটীর অন্তঃপুরচিত্র ও তার পটপরিবর্তনের ঐতিহাসিক দলিল তথা উনিশ শতকের পারিবারিক ইতিহাসকে বুঝতে অপরিহার্য অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথাটি।

উল্লেখপঞ্জি:

১) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল. কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা. কলকাতা: নয়া উদ্যোগ. জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ২৫

২) তদেব, পৃ. ৫

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ. ও বাগল, যোগেশচন্দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা(ষষ্ঠ খণ্ড). কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ. প্রথম একত্রিত সংস্করণ. জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩৭৫-৩৮৭

৪) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল. কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা. কলকাতা: নয়া উদ্যোগ. জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৫৩

৫) তদেব, পৃ. ৩০

৬) ঘোষ, বারিদবরণ(সম্পা). রাসসুন্দরী দাসী আমার জীবন. নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট. দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ. ২০১১, পৃ. ১৯
৭) সান্যাল, মনস্বিতা. এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন(সম্পা). প্রবন্ধ সমগ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়. কলকাতা: চর্চাপদ. প্রথম প্রকাশ. ২০১০, পৃ. ৭
৮) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল. কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা. কলকাতা: নয়া উদ্যোগ. জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩০
৯) তদেব, পৃ. ৩০ ‖ ১০) তদেব, পৃ. ৩০-৩১
১১) কাদির, আবদুর(সম্পা). রোকেয়া রচনাবলী. ঢাকা: বাংলা একাডেমী. প্রথম প্রকাশ. ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৪৫-৫৩
১২) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল. কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা. কলকাতা: নয়া উদ্যোগ. জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩১
১৩) তদেব, পৃ. ৩৫ ‖ ১৪) তদেব, পৃ. ৩৪ ‖ ১৫) তদেব, পৃ. ৩৪ ‖ ১৬) তদেব, পৃ. ৮ ‖ ১৭) তদেব, পৃ. ৩৪
১৮) তদেব, পৃ. ৩৩ ‖ ১৯) তদেব, পৃ. ৩৫ ‖ ২০) তদেব, পৃ. ৫৬ ‖ ২১) তদেব, পৃ. ৩৮
২২) বসু, স্বপন(স). সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ(২য় খণ্ড). কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. প্রথম প্রকাশ. অক্টোবর ২০০৩, পৃ. ৯১
২৩) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল. কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা. কলকাতা: নয়া উদ্যোগ. জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৪৩
২৪) শর্ম্মা, চিরঞ্জীব. কেশবচরিত. কলিকাতা: ভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত. মাঘ ১৮০৬ শকাব্দ, পৃ. ১৮
২৫) তদেব, পৃ. ২৯
২৬) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল. কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা. কলকাতা: নয়া উদ্যোগ. জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৪২
২৭) তদেব, পৃ. ৪৭ ‖ ২৮) তদেব, পৃ. ৪৭ ‖ ২৯) তদেব, পৃ. ৬২ ‖ ৩০) তদেব, পৃ. ৬৭
৩১) তদেব, পৃ. ৬৬-৬৭
৩২) চট্টোপাধ্যায় সতীকুমার. সমন্বয় মার্গ. কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স. মাঘ ১৩৬৭, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২৪৫
৩৩) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল. কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা. কলকাতা: নয়া উদ্যোগ. জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৬৯
৩৪) তদেব, পৃ. ২৫ ‖ ৩৫) তদেব, পৃ. ৭০